প্রাগৈতিহাসিক কেচ্ছা-২

# বানিজ্যে বসতি লক্ষী

মেজবাহউদ্দিন জওহের

এখন ঘোর বর্ষাকাল, কালিয়াকৈরের সাপ্তাহিক হাটের জায়গা পানিতে ডুবে গেছে। শ্রীফলতলীর জমিদার বাড়ীর পাশে টেম্পোরারিভাবে হাটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা বলি 'টানের হাট'। টানের হাট পারতপক্ষে আমি কামাই দেই না- সৈয়দপুর, লালটেকি প্রভৃতি বিখ্যাত স্থানের পাশ দিয়া নৌকায় চেপে হাটে যাওয়ার মজাই আলাদা। বাচ্চু ভাইয়ের হাত ধরে হাটে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। লোকের ভীড়ে হারিয়ে গেলে মুশকিল। একটা হালুই'র দোকানে থরে থরে রসগোল্লা, সন্দেশ, জিলাপি সাজানো। লোকেরা গোগ্রাসে মিঠাই খাচ্ছে। আমরা কিছু করি নাই, শুধু দেখছিলাম। হঠাৎ দোকানের ভেতর থেকে একজন লোক আমাদের দিকে তেড়ে আসল- 'এ্যাই ছ্যামড়ারা, ভাগলি এখান থিকা। যা ভাগ্...'।

তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি। বাচ্চু ভাই বলে- 'হালার মালাওনের বাচ্চা। আমরা কি তগো মিঠাইতে হাত দিছিলাম। র', বড় অইয়া নই। চাকরি কইরা যহন টেকা কামামু, ভাত খামু না তিন বেলায়ই মিঠাই খামু'।

আমার পকেটে চারটি পয়সা আছে, সাহেবালি কাকা দিয়েছেন। কাকা কল দিয়ে লুংগী সেলাই করেন, খলীফা। হাটের দিন তার ব্যস্ততা অনেক, চারটি পয়সা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিদায় করেছেন। এই পয়সা দিয়া গেন্ডারি কিনব না মিঠাই কিনব ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। বাচ্চু ভাই বললেন- 'চাইর পয়সায় মাত্র একটা রসগোল্লা দিব। আর গেন্ডারি মাইনষে কিনা খায় ! দক্ষিন পাড়ার ঘটুগো খেতে কী ভাল গেন্ডারি অইছে, মিছরিদানা। আইজ রাইতেই চুরি করুম। তরে দিমুনে। অহন নো যাই টানা কিনি, তিলা টানা। চাইর পয়সায় অনেক খানি পাওয়া যাইব'।

টানা গুড়ের তৈরী মিষ্টান্ন, উপরে তিলের ছাট্ দেয়া। বড়ই সুস্বাদু জিনিষ, চার পয়সায় অনেকটুকু মিলল। দুইভাই নিবিষ্টমনে খাচ্ছিলাম। এমন সময় 'চাই বিড়ি মেচ, চাই বিড়ি মেচ' বলে কানের কাছে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। তাকিয়ে দেখি বাচ্চু ভাইর বয়েসী একটি ছেলে একটা টিনের চোংগা দিয়ে বিড়ি ও ম্যাচ বিক্রি করছে। গাদিলা পাতার বিড়ি। ছেলেটির পোশাক আশাক ভাল, পরনে হাফ প্যান্ট, গায়ে শার্টও আছে। এমন একটা ছেলে হাটে হাটে ঘুরে বিড়ি-ম্যাচ বিক্রি করছে বড়ই আশ্চর্য্য।

বাচ্চু ভাই বলল- 'ও বাইনার পোলা। ছোটকাল থেইকাই ব্যবসা শিখতাছে। খোজ নিয়া দ্যাখ্, অর বাপ আমাগো হাবেজুদ্দি সরকারের থেইকাও ধনী। ঈশ্, আমার যুদি একটা টেকা থাকত আমিও বিড়ি-ম্যাচের দোকান দিতাম'।

আমি বললাম- 'বিড়ি-ম্যাচের দোকানে খুব লাভ তাই না ভাই'?

-'লাভ মানে ! লাভের উপরে লাভ। এক টেকার বিড়ি তুই কম কইরা অইলেও দেড় টেকায় বিক্রি করতে পারবি। আবার হেই দেড় টেকা দিয়া মাল কিনা আবার বেচবি। এক মাস যুদি এইভাবে বেচতে পারস, টেকায় লাল অইয়া যাবি। হিন্দুরা তো এইভাবে ব্যবসা কইরাই ধনী অয়। আমাগো পুব বাড়ীর মহি'র মা বিড়িম্যাচ, নালি আর কেরুসিন তেলের দোকান দিছে। মহি'রা অখন আর গরীব নাই, সামনের বছর মহি আর কারও বাড়ীত্ চাকর যাইব না'।

কথাটা সত্য। পুব্ বাড়ীর গেন্দু দেওয়ান হদ্দ গরীব। বছরের অধিকাংশ সময়ই না খেয়ে থাকে, মহি মাসিক দুই টাকা বেতনে সারা বছর মানুষের বাড়ীতে চাকর খাটে। ব্যবসার বদৌলতে সেই মহি'রা ধনী হয়ে গেল, আর আমরা এভাবে পড়ে থাকব ?

আমি বললাম- 'দোকান তো দিবা, কিন্তু টেকা পাইবা কই'?

বাচ্চু ভাই আগ্রহের সাথে বললেন- 'তুই যোগাড় কর ম্যাজর। তর বেচন লাগব না, কিচ্ছু করন লাগব না। আমিই বেচুম। তুই আমার পিছে পিছে থাকবি, তরে লাভের অর্ধেক ভাগ দিমু'।

লোভনীয় প্রস্তাব। কিন্তু আমি টাকা পাই কই ? পয়সা না, আধুলি না, একেবারে গোটা একটা টাকা !

উপায় বাচ্চু ভাইই বাতলিয়ে দিলেন- 'চাচীর কাছে চাবি, খুব কান্দাকাটি করবি। কিন্তু সাবধান, দোকানের কথা কইলাম কবি না। তাইলে কিন্তু এক পয়সাও দিব না। আরও একটা পথ আছে। চাচা যহন কাচারি থন বাড়ী আহে, পকেট বোঝাই পয়সা থাকে। চুপচাপ চাচার পকেট থেইকা একটা কইরা সিকি নিয়া উগারের বাঁশের কোটরে ফেলবি। চাইরদিন জমাইলেই এক টেকা অইয়া যাইব'।

উপায়টা মন্দ না, তবে বড় রিস্কি। ধরা পড়লে মেরে হাড় গুড়ো করে ফেলবে। সুতরাং বললাম- 'আরও একটা উপায় আছে ভাই। মজ্জেমের কোমরে বাইটা'র মধ্যে অনেক টেরা পয়সা আছে। কুনভাবে যুদি বাইটা ছিড়া পয়সাগুলি নেওন যায়..'। (আগের দিনে এক পয়সার মুদ্রা ছিল তামার তৈরী। মুদ্রাগুলির মাঝখানে ছিদ্র ছিল, তাই এগুলির লৌকিক নাম ছিল টেরা পয়সা)।

-'দুর বোকা, অই কয়ডা টেরা পয়সা দিয়া কী অইব ? ষোল পয়সা অইলে মাত্র অইব চাইর আনা...'।

বাচ্চু ভাই'র প্রস্তাবটা মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। একটা টেকা যোগাড় করতে পারলেই কেল্লা ফতে, যতখুশী রসগোল্লা খাও, যতখুশী বরফি খাও। টানা, ছরি- এইসব গরীব মানুষের মিষ্টির ধারেকাছেও যেতে হবে না আর।

বাচ্চু ভাই পার্থিব সব বিষয়েই আমার চেয়ে উপরে। মাছ মারা, হাল বাওয়া কিংবা অন্য যে কোন সাংসারিক কাজকর্মে তিনি বড়দের মতোই উস্তাদ। গুটু খেলায় তার পাঁচ গাঁয়ে সুনাম। সেই তিনিই আমাকে ইদানীং তোয়াজ করে চলেন। উদ্দেশ্য একটাই, যদি কোনভাবে বিজিনেসের ক্যাপিটেল বাবদ একটা টাকা যোগাড় করে দিতে পারি।

সেদিন রাতে আমাকে বললেন- 'এ্যই ম্যাজর, শীগগীর আয়...'।

বিষয়টা কী, তাড়াতাড়ি তার পিছু নেই আমি। আমাকে ডিংগিতে চড়িয়ে লগি মেরে বিলের দিকে রওনা দিলেন তিনি। বিলের কিনারে একটা আমন খেতে তার নৌকা থামল। মাচাইল উঠাতেই আমার চক্ষু চড়কগাছ, সেখানে এক বোঝা কুশাইল। আজে বাজে কুশাইল না, খাটি মিছরিদানা, এক্কেরে হলুদের মতো রং। এর একটা গেন্ডারি খেলে কইলজা ঠান্ডা হয়ে যায়।

বাচ্চু ভাই বললেন- 'ঘটুগো খেত থেইকা কাটছি। কাইল আমারে কয়- এ্যাই, খেতের আশেপাশে ঘুর ঘুর করস ক্যান্ ? কুশাইলে হাত দিবি তো মাইরা হাতপাও পেটের ভিতর হান্দাইয়া দিমু। হালা..., অহন দে হান্দাইয়া, এক বোঝা কাটছি'।

- 'এ্যাত কুশাইল দিয়া কী করবা ভাই'?
- খামু, যে কয়ডা পারি অহন খামু। বাকীগুলা আমন খেতে লুকাইয়া রাখুম। রোজ সন্ধার পর আইসা খামু। গেদির লাইগা দুই চাইরডা নিতে মন চায়, কিন্তু নেওন যাইব না। বাড়ীতে দেখলে মাইরা হাড্ডি গুরাগুরা কইরা ফালাইব'।

দুই ভাই মহানন্দে গেন্ডারি চিবুতে থাকি।

খাওয়ার এক ফাকে তিনি বললেন- 'টেকার কি করলি'?

-'মা দেয় না। কয়- টেকা কি গাছের গুটা যে চাইলেই পাওয়া যায় ? বাজান কবে বাড়ীত আইব ঠিক আছে'।

বাচ্চু ভাই বললেন- 'দুই দিন কামলা দিলেই এক টেকা অইয়া যায়। আমি বড়দের সমানই কাম করতে পারি, আমারে না হয় আট আনা কইরা রোজ দিল'।

- ‘তুমি কামলা দিবা’!
- ‘না, কইলাম আর কি। কামলা দিবার গেলে রক্ষা আছে, বাড়ী থেইকা খেদাইয়া দিব। আচ্ছা তুইই ক’ দেহি, লেখাপড়ার ফাকে ফাকে দুই চাইর দিন কামলা দিলে ক্ষতি কী’?

অবশেষে টাকার যোগাড় হয়ে গেল। আমার কাছে চার আনা পয়সা ছিল। অনেকটা অলৌকিকভাবে আরও আট আনা পয়সা হাতে এসে গেল। পশ্চিম বাড়ীর কিয়ামুদ্দিন সরকার আমার বড়মামা। খুব বড়লোক। বজরা নৌকায় চলাফেরা করেন। তার ছোট ছেলে সাচ্চা মিয়া পাড়ার যুবকদের ঈর্ষার স্থল। লাক্স সাবান দিয়া গোসল করেন, সিল্কের লুংগী পড়েন। তিনি আমাকে খুব আদর করেন; আমি প্রায়ই তার কাছে যাই এবং তার হাতপা টিপে দেই। আমার সমস্যার কথা শুনে গোটা একটা আধুলি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন- ‘নে ধর, দোকান দিলে রোজ আমারে এক প্যাকেট কইরা বিড়ি দিবি’।

আমি অবাক। সাচ্চা ভাই বড়লোক মানুষ, বগলা সিগারেট খান। তাইনে গাদিলা পাতার বিড়ি খাবেন, ইডা কেমুন কথা !

আমার বিস্ময় দেখে তিনি বললেন- ‘তর দোকান থেইকা আমি জিনিষ না কিনলে দোকান চলব কেমনে ? আমি না খাই কামলাগো দিমু। তয় রোজ এক প্যাকেট আমার কাছে বেচবি, বুঝলি’।

এই না হলে বড়লোক ! দিলটা আকাশের মতো। এক কথায় গোটা একটা আধুলি দিয়ে দিতে পারে ! খুশীতে লাফাতে লাফাতে বাচ্চু ভাইর খোজ করি। আমার কাছে বারো আনা আছে, আর চার আনা হলেই ব্যবসা ষ্টার্ট করা যায়। এমন আনন্দের মুহূর্ত মানুষের জীবনে কমই আসে।

মহা সমারোহে আমাদের বিজিনেস শুরু হয়ে গেল। চৌকির নীচে বহুদিনের পুরোনো একটা ভাংগা টিনের তোরংগ আপাততঃ আমাদের শপ কাম গোডাউন। বিড়ির বান্ডিল ও ম্যাচগুলি সেখানে পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা হলো। পোলাপানে যেন কোনভাবেই সেটা খুলে জিনিসপত্র তছনছ করতে না পারে সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে। মার্কেটিংয়ের ব্যাপারেও বিস্তারিত আলোচনা হলো। মহি’র মা পয়সায় চারটা বিড়ি ও একটা ফাও দেয়। আমরা ঠিক করলাম- আমরা দুইটা ফাও দেব- পয়সায় ছয়টি বিড়ি। মার্কেট হাতে রাখতে এ ছাড়া কোন উপায় নাই। প্রথম প্রথম বেশী লাভ হবে না, তবে মার্কেট একবার কব্জায় এসে গেলে তখন ?

বাচ্চু ভাই বললেন- ‘বাজান কইছে আমারে একটা তোড়া বানাইয়া দিব। তোড়াডা পাইলে আর কোন সমস্যা নাই, কোমরে শক্ত কইরা বাইন্দা রাখুম। অখন পয়সাপাতি কোমরে গুইঞ্জা রাখলেই চলব। মাত্র তো কয়ডা দিন। আর হ্যা, সারাদিন যা বিক্রি অইব তার সব পয়সা আমার কাছে থাকব। সাবধান, তুই পয়সা নিয়া ঘুরবি না। তুই ভ্যাবলা, হারাইয়া ফেলবি’।

প্রথমে বেচা-বিক্রি তেমন একটা হয় না। আমাদের দোকানের কথা অনেকে জানেই না। সারাদিন হা করে বসে থাকি- এই বুঝি কেউ বিড়ি কিনতে আসল। কিন্তু না, অন্যকোন ফালতু কামে এসেছে। পৃথিবীতে বিড়ি কেনার চেয়ে জরুরী আর কোন্ কাম আছে ?

ঘনিষ্ট মহলে বিড়ির ক্যানভাসে লেগে যাই। নুরু, হবি, মজু, দেলু, লোকমান, সিরা সবাইকে বলে দেই যেন তারা কখনও বিড়ি টিরি মহি’র মা’র দোকান থেকে না কিনে। মহি’র মা’র চেয়ে আমরা পরিমানে বেশী দেই। ব্যবসাতে লাভ হলে আমরা একটা চামড়ার বল কিনব, সবাই খেলতে পারবে। মহি’র মা হাজার লাভ করলেও বল কেন একটা জাম্বুরাও কিনে দেবে না। সুতরাং নিজেদের স্বার্থেই তাদের উচিৎ আমাদের সহযোগীতায় এগিয়ে আসা। সবাই এক বাক্যে আমাদের সমর্থন করল, তবুও বিক্রিবাট্টা তেমন হচ্ছে না।

বাচ্চু ভাই আশ্বাস দিয়ে বললেন- ‘চিন্তার কিছু নাই, ব্যবসা দাড়াইতে সময় লাগে। একটা কাপড়ের থইলা যোগাড় করতে পারলে আর তোড়াডা পাইলে আমরা হাটে গিয়া বেচতে শুরু

করুম। মুলধন বাড়লে বিড়ির সাথে বাতাসা আর টানাও রাখুম। লাভও অইব মনের আশ মিটাইয়া খাওনও যাইব, বুঝলি’?
বুঝতে পারলাম – সোনালি দিন আমাদের সামনে, এখন শুধু একটু ধৈর্য্য ধরার পালা।

সবাই বলে থাকেন যে নিষ্ঠার সাথে লেগে থাকলে সফলতা আসেই। আমি তাদের কথার বিরুদ্ধাচারণ করতে চাই না, তবে একটা কথা যোগ করতে চাই। শুধু নিষ্ঠা থাকলেই সাধন হয় না, সেই সাথে ভাগ্যও থাকতে হয়। নইলে দেখুন না, সেদিনের সেই উদ্দমী বালক দু’টির নিষ্ঠার কোন ঘাটতি ছিল না। অথচ ভাগ্য দেবীর প্যাচে পড়ে তাদের এমন রমরমা ব্যবসাটা লাটে উঠল। দুই হাত দিয়ে রসগোল্লা-সন্দেশ খাওয়ার ইচ্ছা পুরণ হলো না, বড়োই আফশোস।
তখন ছিল বর্ষাকাল, পানিতে ভীষণ ধার। একটা তালের ডোঙ্গায় চেপে বাচ্চু ভাই পশ্চিম বাড়ীর ফুটকা ভাইদের বাড়ী যাচ্ছিলেন। তালের ডোঙ্গা খুবই টালমাটাল বাহন, একটু ইম্ব্যালান্স হলে যে কোন মুহূর্তে তা উল্টে যেতে পারে। বাচ্চু ভাই পাকা মাঝি, তার হাতে ডোঙ্গা পঙ্খীরাজের মতো উড়ে চলে। অথচ ভাগ্যেত্ম ফের, তার হাতেই ডোঙ্গা মাঝ গাঙে উল্টে গেল ! এর চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় আল্লাহর দুইনায় আর কী আছে ?
ডোঙ্গা উল্টে যাওয়া কোন বিষয় না, যে কোন সময় তা ঘটতেই পারে। মর্মান্তিক বিষয় হলো ভাইয়ের লুংগীটি। সাতরে ডোঙ্গা সোজা করার প্রচেষ্টায় কখন যে তা কোমর হতে বিযুক্ত হয়ে বর্ষার প্রচন্ড স্রোতে গা ভাসিয়েছে তিনি তা টেরও পাননি। তার তপনের গোঁজে আমাদের ব্যবসার সমুদয় মুলধন গিঠটু মারা ছিল। ডোঙ্গা সোজা করে তিনি যখন তাতে উঠে বসলেন তখনই তিনি শুধু বুঝতে পারলেন যে নিমকহারাম তপন আমাদের সর্বস্ব নিয়ে ডুব মেরেছে, তার পরণে এখন নির্ভেজাল জন্মদিনের পোষাক।
- ‘অরে বাবারে, এ আমার কী সব্বনাশ অইল রে, অরে বাবারে এ কী সব্বনাশ অইল...’।
বারো বছরের কিশোরের সেই মর্মান্তিক আহাজারি শুনে সেদিন সকলে হেসে কুটপাট। শুধু বেহেশতে বসে খোদাতায়ালার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছিল কিনা কেউ জানে না।
বাচ্চু ভাইর কান্নার শব্দ আজও ভেসে বেড়ায়, আমি কান পাতলেই তা শুনতে পাই।
মেজবাহউদ্দিন জওহের
মে/ ২০০৫